জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞান
Astrophysics

ইউনিট ১১

ভূমিকা (Introduction)

রাতের আকাশের অপরূপ সৌন্দর্য ও রহস্য আদিকাল থেকেই মানুষকে বিস্মিত ও অভিভূত করেছে। মানুষ শুধু আকাশের পানে তাকিয়েই ক্ষান্ড় হয়নি বরং এ মহাবিশ্ব সম্পর্কে জানার জন্য বিজ্ঞানীরা অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। দূরবর্তী নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, গ্যালাক্সি থেকে শুর" করে আমাদের পৃথিবী এবং অতি ক্ষুদ্র অণু-পরমাণু সবকিছু নিয়েই মহাবিশ্ব।

পদার্থবিজ্ঞানের যে শাখায় আকাশ ও মহাকাশের সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকা ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যাদির বিবরণসহ আলোচনা ও অনুসন্ধান করে তাকে জ্যোতিপদার্থবিজ্ঞান বলে।

পাঠ- ১১.১: মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্য
Mystery of creation of the Universe

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১১.১.১ মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্য
Mystery of creation of the Universe

মানুষের জানার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। তথাপি মানুষ আকাশমন্ডলীর ঘটনা ও নিদর্শনাবলী পর্যবেক্ষণ করে বিভিন্ন তত্ত্ব নিরূপনে সচেষ্ট রয়েছে। মহাবিশ্ব কেন সৃষ্টি হলো, কিভাবে সৃষ্টি হলো, কেনইবা এটি টিকে আছে এ সম্পর্কে আমাদের কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। তবে এটি কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে এর বিবর্তনের ধারা সম্পর্কে আমরা অনেক কিছুই জানতে পেরেছি। রাতের আকাশে আমরা অসংখ্য তারা বা নক্ষত্র দেখতে পাই। এমন অসংখ্য নক্ষত্র নিয়ে গঠিত হয়েছে একটি গ্যালাক্সি।

সপ্তদশ শতাব্দীতে টেলিস্কোপের ব্যবহার থেকে জানা গেল যে, সূর্য আমাদের ছায়াপথ গ্যালাক্সির (Milky way) অন্যান্য নক্ষত্রের মতোই একটি সাধারণ নক্ষত্র। তখন মনে করা হতো, সূর্য হচ্ছে আমাদের গ্যালাক্সির কেন্দ্রবিন্দু। বিংশ শতাব্দীতে এসে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জেনে যান যে, সূর্যের অবস্থান আমাদের গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকে অনেক অনেক দূরে। এরূপ কোটি কোটি গ্যালাক্সি নিয়ে গঠিত হয়েছে আমাদের এ মহাবিশ্ব। আমাদের ছায়াপথ গ্যালাক্সিতে নক্ষত্রের সংখ্যা প্রায় 10^{11}। মহাবিশ্বে এরকম প্রায় 10^{11} সংখ্যক গ্যালাক্সি রয়েছে। আর প্রত্যেকটি গ্যালাক্সিতে রয়েছে আমাদের গ্যালাক্সির প্রায় সমসংখ্যক নক্ষত্র। পৃথিবী মহাবিশ্বের তুলনায় অতি অতি ক্ষুদ্র। পৃথিবী থেকে মহাকাশে নক্ষত্রদের দেখতে কাছাকাছি মনে হলেও এদের পরস্পরের মধ্যে রয়েছে অনেক আলোক বর্ষের ব্যবধান।

সভ্যতার সেই শুর" হতেই বিজ্ঞানীগণ এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্য এবং পরিণতি সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা পোষণ করে আসছেন। এ সব ধারণা এবং বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার ফল হিসেবে বিজ্ঞানের একটি শাখা সৃষ্টি হয়েছে, যা কসমোলজি (Cosmology) বা 'মহাজাগতিক বিজ্ঞান' নামে পরিচিত। বিংশ শতাব্দীতে দুই জন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের দ্বারা দুটি পরীক্ষা সংঘটিত হয়, যেগুলোর মাধ্যমে মহাবিশ্ব সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক ধারণা প্রায় সকল পদার্থ বিজ্ঞানীদের মাঝে গৃহীত হয়েছে। পরীক্ষা দুটি হলো-

১। মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ এবং

২। মহাজাগতিক পশ্চাৎপট বিকিরণ।

নিম্নে পরীক্ষা দুটির পর্যবেক্ষণলব্ধ ফলাফল বর্ণনা করা হলো:

(১) মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ

(Expannon of the Universe)

এডউইন হাবল

১৯২০ সালে বিখ্যাত মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডউইন হাবল (Edwin Hubble) তার 2.5 m টেলিস্কোপের সাহায্যে গ্যালাক্সিগুলো পর্যবেক্ষণের সময় লক্ষ্য করলেন যে, গ্যালাক্সিগুলো পরস্পর থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। দূরবর্তী গ্যালাক্সি এর নক্ষত্র থেকে আসা আলো পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, নক্ষত্রের বর্ণালীর ফ্রনহকার কালো রেখাগুলো ধীরে ধীরে লাল বর্ণের দিকে সরে যাচ্ছে। ডপলার ক্রিয়ার মাধ্যমে এ থেকে সিদ্ধান্ড় আসা যায় যে, দূরবর্তী গ্যালাক্সি বা গ্যালাক্সিগুচ্ছ আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

১৯২৯ সালে হাবল তাঁর দীর্ঘ নয় বছরের পর্যবেক্ষণের ফলাফল পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ড়ে উপনীত হন যে, মহাবিশ্ব অত্যন্ড় দ্রুতগতিতে সম্প্রসারিত হচ্ছে। তাঁর এই সিদ্ধান্ড়কে তিনি একটি সূত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেন যা হাবলের সূত্র নামে পরিচিত। হাবলের সূত্রনুসারে-

গ্যালাক্সিসমূহ নিজেরা এবং পৃথিবী হতে দ্রুতগতিতে দূরে সরে যাচ্ছে এবং গ্যালাক্সিগুলোর মধ্যে দূরত্ব যতো বেশি পরস্পর হতে দূরে সরে যাওয়ার বেগও ততো বেশি।

পৃথিবী হতে কোনো গ্যলাক্সির দূরত্ব d এবং দূরগমনের বেগ v হলে হাবলের সূত্রানুসারে,

$$v \propto d$$
$$= Hd$$

এখানে, H একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক, যা হাবল ধ্রুবক বা হাবল প্যারামিটার নামে পরিচিত। এর একক হচ্ছে s^{-1}। তবে প্রচলিত একক হচ্ছে কিলোমিটার পার সেকেন্ড পার মেগাপারসেক বা $1\frac{\text{kms}^{-1}}{\text{Mpc}}$।

সাম্প্রতিক বিভিন্ন পরীক্ষালব্ধ ফলাফল থেকে হাবল প্যারামিটার এর সর্বোত্তম মান পাওয়া যায়

$$\text{H} = 72\frac{\text{kms}^{-1}}{\text{Mpc}} \quad [1\ \text{Mpc} = 3.084\times10^{19}\,\text{km}]$$

হাবল প্যারামিটার এর গ্রহণযোগ্য মান ব্যবহার করে আমরা মহাবিশ্বের বয়স $14\times10^{9}\,\text{y}$ বা ১৪০০ কোটি বছর নির্ণয় করতে পারি।

আবার pc বা পারসেক (parsec) হচ্ছে মহাবৈশ্বিক দূরত্ব পরিমাপের একক। সূর্য বা পৃথিবীর মধ্যকার গড় দূরত্বকে এক অ্যাস্ট্রোনোমিক্যাল ইউনিট (AU) বলে। 1 AU = 1.495×10^{8} km। 1 AU দৈর্ঘ্যের কোনো চাপ (arc) যে দূরত্বে ঠিক এক সেকেন্ডে কোণ উৎপন্ন করে সেই দূরত্বকে 1 pc বা এক পারসেক বলে। 1 pc = 3.261 y = 3.0857×10^{13} km বা Mpc (mega parsec) = 10^{6}pc = 3.0857×10^{19} km.

(২) 'মহাজাগতিক- মাইক্রোওয়েভ পশ্চাৎপট বিকিরণ

Cosmic Microwave Background Radiation- CMB

যেহেতু গ্যালাক্সিগুলো পরস্পর হতে দূরে সরে যাচ্ছে, সুতরাং অতীতে কোনো একসময় সেগুলো অবশ্যই একসাথে ছিল। প্রাথমিক অবস্থায় মহাবিশ্ব অকল্পনীয় ঘনত্বের বস্তু ও বিকিরণ দ্বারা গঠিত ছিল। মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের ফলে, এই বস্তু ও বিকিরণ ততোই শীতল হতে থাকল। এর প্রেক্ষিতে বিকিরণের কণা বা ফোটনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকল। মহাবিশ্বের বিকিরিত শক্তির একটি নির্দিষ্টমাত্রা বা পরিমাণ আছে এবং সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বে ঐ নির্দিষ্ট শক্তিও সম্প্রসারিত অংশে বিকিরিত হচ্ছে। এখনো, ঐ বিকিরিত অবশিষ্ট শক্তির অস্ড়িত্ব নির্ণয় করা যায়। এই বিকিরণকে মহাজাগতিক মাইক্রোওয়েভ পশ্চাৎপট বিকিরণ বলে।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি ১৯৬৫ সালে এই জাতীয় বিকিরণের প্রথম সন্ধান পান আর্নো অ্যালান পেনজিয়াস (Arno Allan Penzians) এবং রবার্ট উইলসন (Robert Wilson) নামের দুইজন মার্কিন পদার্থবিজ্ঞানী। তাঁরা বেল ল্যাবরেটরিতে উপগ্রহ যোগাযোগের জন্য একটি মাইক্রোওয়েভ এন্টেনা নিয়ে কাজ করেছিলেন। তাঁরা দেখলেন যে, যেকোনো দিকেই এন্টেনাকে তাক করা হোক না কেন, এন্টেনাতে একটি অদ্ভূত বিকিরণ তথা তরঙ্গ চারদিক থেকে আসছে। পেনজিয়াস ও উইলসন ব্যাপক পর্যবেক্ষণের পর সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, মাইক্রোওয়েভ এন্টেনাতে মহাবিশ্বের প্রাথমিক অবস্থার তীব্র বিকিরণের অবশিষ্ট কিছু শক্তির অস্তিত্ব ধরা পড়ছে। এই বিকিরণ নির্দিষ্ট কোনো শনাক্তকৃত উৎস থেকে নয়, বরং সারা বছরব্যাপী সবসময় সকল দিক থেকে আসছে। তারা হিসাব করে দেখান যে, মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণের তাপমাত্রা প্রায় 3 K এবং সবাই মেনে নিলেন যে, এই মাইক্রোওয়েভ বিকিরণ বিগ ব্যাংগ মডেল অনুযায়ী প্রত্যাশিত অবশিষ্ট বিকিরণ। তাঁদের এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য ১৯৭৮ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরষ্কার পান।

পেনজিয়াস উইলসন

১১.১.২ বিগ ব্যাংগ তত্ত্ব

Big Bang Theory

১৯২৭ সালে বেলজিয়ামের জ্যোতির্বিদ জর্জ লেমাইটার (George Lemaitre) প্রসারণশীল বিশ্ব সংক্রান্ত তত্ত্ব প্রদান করেন যা হাবলের সূত্রের সাথে মিলে যায়। ১৯৩১ সালে তিনি আরো প্রস্তাব করেন যে, প্রসারণশীল বিশ্বকে যদি সময়ের সাথে পিছিয়ে নেয়া হয়, তাহলে একটা বিন্দুতে আমরা উপনীত হতে পারবো, যেখানে মহাবিশ্বের সমস্ত ভর পুঞ্জীভূত ছিল, যাকে আদিম পরমাণু বলা যেতে পারে এবং এখান থেকেই স্থান-কালের উদ্ভব। তাই জর্জ লেমাইটারকে বিগ ব্যাংগ মডেলের জনক বলা হয়ে থাকে।

জর্জ গ্যামো মহাবিশ্বের প্রসারণ সম্পর্কে ধারণা করেছিলেন যে, যেহেতু গ্যালাক্সিসমূহ পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে তাই সুদুর অতীতে নিশ্চয়ই তারা পরস্পরের খুব কাছাকাছি ছিল। অর্থাৎ কোনো এক সময় মহাবিশ্বের সব বস্তুপিন্ড একত্রিত অবস্থায় ছিল এবং এক মহাবিস্ফোরণের ফলেই এগুলো ক্রমেই ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। এই তত্ত্বের নাম মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব বা বিগ ব্যাংগ তত্ত্ব। বিগ ব্যাংগ বা মহাবিস্ফোরণ আমাদের পরিচিতি বিস্ফোরণ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক একটি ঘটনা। সাধারণ বিস্ফোরণ একটি নির্দিষ্ট স্থান বা কেন্দ্র থেকে শুরু করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু বিগ ব্যাংগের বিস্ফোরণ একই সময় সকল স্থানে ঘটেছিল। প্রকৃতপক্ষে বিগ ব্যাংগ বলতে মহাবিশ্ব সৃষ্টির 'শুরু' বোঝায় যখন থেকে স্থান ও সময় গণনা আরম্ভ হয়। অর্থাৎ বিগ ব্যাংগের পূর্বে কিছুই ছিল না। বিগ ব্যাগ -এর পর 10^{-43}s পর্যন্ত কী ঘটেছিল তা আমরা জানতে পারিনি, কিছুটা ধারণা পেয়েছি মাত্র। মহাবিশ্ব শুরু হয়েছিল একটি অপরিমেয় ক্ষুদ্র, অসীম তাপ ও অসীম ঘনত্ববিশিষ্ট শক্তির উৎস থেকে। একে বলা হয় অনন্যতা বা অদ্বৈত বিন্দু (Singularity)। এতে সব মৌলিক বলগুলো একত্রে একীভূত বল হিসেবে ছিল। মহাবিশ্ব সৃষ্টির 10^{-43}s পরে পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলো কার্যকারিতা লাভ করে। এ সময়কে পণ্ডাঙ্কের সময় বলা হয়। এ সময় মহাবিশ্ব উচ্চ শক্তির ফোটনে পরিপূর্ণ ছিল। ফোটনগুলো খুব ঘন সন্নিবিষ্ট অবস্থায় ছিল এবং এদের তাপমাত্রা ছিল 10^{33}K।

জর্জ গ্যামো

10^{-43}s থেকে 10^{-38}s সময়কালকে ধরা হয় মহাএকীভবনের কাল। এ সময়ে মহাকর্ষ বল একীভূত অবস্থায় থাকা অন্য মৌলিক বলসমূহ থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং আদি মৌলিক কণা ও প্রতি কণাগুলো তৈরি হতে শুরু করে। 10^{-36}s থেকে 10^{-32}s সময়কালে মহাবিশ্বের তাপমাত্রা 10^{32}K হতে 10^{27}K এ নেমে আসে। এ সময়ে একটি দশা পরিবর্তন ঘটে, যার ফলে একীভূত বল থেকে সবল নিউক্লিয় বল পৃথক হয়ে যায়। এই সময়ে মহাবিশ্ব খুব দ্রুত সূচকীয়ভাবে প্রসারিত হতে শুরু করে। এ কালকে স্ফীতিকাল এবং এ ঘটনাকে মহাবিশ্বের স্ফীতি (Inflation) বলে। মহাবিশ্ব এ সময়ে প্রচন্ডভাবে ফুলে ফেঁপে ওঠে এবং আদি অবস্থার প্রায় 10^{30} গুণ বড় হয়ে যায়। এ সময় শক্তিশালী বলের প্রভাবে কোয়ার্ক কণাগুলো কাছাকাছি আসে। মহাবিশ্ব তখন ফোটন,

চিত্র ১১.১ বিগ ব্যাংগ

কোয়ার্কস ও লেপটনের গরম স্যুপে পরিণত হয়। $10^{-35}\,s$ থেকে $10^{-5}\,s$ পর্যন্ড় কোয়ার্ক- লেপটন একত্রে স্যুপ অবস্থায় ছিল।

$10^{-36}\,s$ থেকে $10^{-12}\,s$ সময়কালকে দুর্বল বলের কাল হিসেবে ধরা হয়। এ সময়ে দুর্বল বল (Weak Force) তাড়িৎ চৌম্বক বল থেকে পৃথক হয়ে যায়। ফলে এ সময় মৌলিক বল হয় চারটি। এ সময় মহাবিশ্বের তাপমাত্রা $10^{12}\,K$ এ নেমে আসে।

মহাবিস্ফোরণের $10^{-12}\,s$ থেকে $10^{-6}\,s$ সময়কালকে কোয়ার্ককাল হিসেবে গণ্য করা হয়। এ সময় কোয়ার্ক এবং প্রতি-কোয়ার্ক পরস্পরের সংস্পর্শে এসে পরস্পরকে ধ্বংস করে দেয়। শুধু অল্প কিছু কোয়ার্ক (প্রায় প্রতি বিলিয়নে একটি) এদের প্রতি-কোয়ার্ক না পাবার জন্য বেঁচে যায় বা রক্ষা পায়, যেগুলো অবশেষে সংযুক্ত হয়ে পদার্থ গঠন করে।

বিগ ব্যাংগ এর পরে $10^{-6}\,s$ থেকে $1\,s$ সময়কালকে হ্যাডরনের কাল হিসেবে গণ্য করা হয়। এ সময়ে মহাবিশ্বের তাপমাত্রা $10^{11}\,K$ -এ নেমে আসে। কোয়ার্কগুলো পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হয়ে হ্যাডরন তৈরি করে। হ্যাডরন পর্বের চূড়ান্ড় অবস্থায় ইলেকট্রনগুলো প্রোটনের সাথে সংঘর্ষের ফলে একীভূত হয়ে নিউট্রন উৎপন্ন করে এবং নিউট্রিনো নামে আর একটি কণা নির্গত হয়।

বিগ ব্যাগ এর $1\,s$ থেকে 3 মিনিট সময়কালকে লেপটনের কাল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। হ্যাডরন কাল শেষে বেশির ভাগ হ্যাডরন ও প্রতি হ্যাডরন বিনাশিত হয়। এর ফলে লেপটনসমূহ, যেমন- ইলেকট্রন এবং প্রতি ইলেকট্রন (পজিট্রন) মহাবিশ্বে আধিপত্য বিস্ড়ার করে। ইলেকট্রন ও পজিট্রন যখন সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তখন এগুলো পরস্পরকে বিনাশ করে এবং ফোটনরূপে শক্তির আর্বিভাব ঘটে। ফোটনগুলো আবার পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং ইলেকট্রন ও পজিট্রন যুগল সৃষ্টি করে।

মহাবিস্ফোরণের 3 মিনিটের মাথায় তাপমাত্রা $10^{9}\,K$ -এ নেমে আসে। তখন মহাবিশ্ব যথেষ্ট শীতল হয়েছে। এসময় নিউক্লিয় ফিউশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রোটন ও নিউট্রন একত্রিত হয়ে অল্পভরের নিউক্লিয়াসসমূহ যেমন- ডিওটেরিয়াম, হিলিয়াম এবং লিথিয়াম গঠন করে। কিন্তু ফোটন কণাগুলো সৃষ্ট নিউক্লিয়াসের সাথে মিথস্ক্রিয়া শুর" করায় খুব বেশি দূর যেতে পারে না। ফলে মহাবিশ্ব তখনও অস্বচ্ছ ছিল।

মহাবিস্ফোরণের 3×10^{5} বছরের সময় তাপমাত্রা $400\,K$ এ নেমে আসে। মহাবিশ্ব তখন যথেষ্ট শীতল। এ সময়ে ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসের সাথে সংযুক্ত হওয়ার মাধ্যমে পরমাণু গঠন করছে। যেহেতু ফোটন আধান নিরপেক্ষ কণা, এ কারণে নিরপেক্ষ পরমাণু এর সাথে খুব কম মিথস্ক্রিয়া করে। তাই আলো তখন বহুদূর পরিভ্রমণ করতে পারে। অর্থাৎ এ সময়ে মহাবিশ্ব খুব স্বচ্ছ (Transparent) দেখায়। এই বৈশিষ্ট্যমূলক সময়কে পুনর্গঠন কাল (Recombination time) বলা হয়। এ প্রক্রিয়ায় মুক্ত ইলেকট্রনসমূহ পরমাণুতে আবদ্ধ হবার ফলে পশ্চাৎপট বিকিরণ সর্বত্র ভ্রমণ করার সুযোগ পায়। যা আমাদের সংবেদনশীল টেলিস্কোপে ধরা পড়েছে। এ সময়ে মহাবিশ্বে প্রায় 75% হাইড্রোজেন, 25% হিলিয়ামের সাথে খুব অল্প পরিমাণ লিথিয়ামের উপস্থিতি দেখা যায়।

বিগ ব্যাংগ এর ৩০০ থেকে ৫০০ মিলিয়ন বছরের মধ্যে মহাকর্ষের প্রভাবে হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম গ্যাসের পরমাণু সমূহ মহাবিশ্বের বিভিন্ন স্থানে আলাদাভাবে একত্রিত হতে শুর" করে এবং নিজস্ব মহাকর্ষের প্রভাবে জমাট বাঁধতে থাকে এবং সংকোচিত হয়। ফলে তাপমাত্রা বেড়ে যায় এবং হাইড্রোজেন পরমাণুর মধ্যে নিউক্লিয় বিক্রিয়া শুর" হয় এবং কালক্রমে নক্ষত্র ও গ্যালাক্সিগুলোর সৃষ্টি হয়।

উদাহরণ–১১.১। উরসা মেজর গ্যালাক্সিগুচ্ছ আমাদের গ্যালাক্সি থেকে 10^{9} আলোকবর্ষ দূরত্বে অবস্থিত। হাবল ধ্র"বক $72\frac{\mathrm{kms}^{-1}}{\mathrm{Mpc}}$ হলে উরসা মেজর গ্যালাক্সিগুচ্ছ আমাদের থেকে কত বেগে দূরে সরে যাচ্ছে?

সমাধান: আমরা জানি,

$$v = Hd$$

$$= \frac{.72\mathrm{km} - 1\times10^{9}1y}{3.26\times10^{6}1\mathrm{y}}$$

এখানে,

দূরত্ব, $d = 10^{9}\,\mathrm{y}$

হাবন ধ্র"বক, $\mathrm{H} = 72\frac{\mathrm{kms}^{-1}}{\mathrm{Mpc}}$

$= 22.08 \times 10^3 \text{ kms}^{-1}$

উঃ $= 22.08 \times 10^3 \text{ kms}^{-1}$

$= \frac{72 \text{ kms}^{-1}}{3.26 \times 10^6 \text{1y}}$

বেগ, $v = ?$

সার-সংক্ষেপ :

বিগ ব্যাংগ : বিগ ব্যাংগ বা মহাবিস্ফোরণ আমাদের পরিচিত বিস্ফোরণ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক একটি ঘটনা। সাধারণ বিস্ফোরণ একটি নির্দিষ্ট স্থান বা কেন্দ্র থেকে শুর" করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু বিগ ব্যাংগের বিস্ফোরণ একই সময় সকল স্থানে ঘটেছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১১.১

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বিগ-ব্যাংগ সংঘটিত হয়েছিল?

(ক) মহাকাশে (খ) পৃথিবীতে (গ) সৌরজগতে (ঘ) সর্বত্র

২। মহাজাগতিক দূরত্ব গণনায় সাধারণত কোন একক ব্যবহার করা হয়?

(ক) μm (খ) km (গ) year (ঘ) pc (parsec)

পাঠ-১১.২ : পদার্থবিজ্ঞানের আলোকে মহাবিশ্বের চূড়ান্ড় পরিণতি

Ultimate Fate of the Universe in Terms of Physics

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- পদার্থবিজ্ঞানের আলোকে মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন।

মহাবিশ্বের চূড়ান্ড় পরিণতি কী হবে, আধুনিক ভৌত বিশ্বতত্ত্বের একটি অতি গুর"ত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয়। মহাবিশ্বের আদৌ কোনো পরিণতি বা শেষ আছে কি না এবং থাকলেও তা কী রকম হতে পারে? মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কে যখনই বিগ ব্যাংগ বা মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব জনপ্রিয়তা পেয়েছে তখনই এর পরিণতি অবশ্যম্ভাবী হয়ে দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে মহাবিশ্বের বিভিন্ন পরিণতির ব্যাপারে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে। এই তত্ত্বগুলো ভালভাবে বোঝার জন্য অদৃশ্য বস্তু, অদৃশ্য শক্তি, মহাবিশ্বের জ্যামিতিক গঠন ইত্যাদি সম্পর্কে জানা দরকার। নিচে এদের সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১১.২.১ অদৃশ্য বস্তু (Dark Matter)

পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দেখা যায় একটি গ্যালাক্সির নক্ষত্রগুলোর অধিকাংশের ভর গ্যালাক্সির কেন্দ্রে বিন্যস্ড় থাকে। আর মহাকর্ষ বলের প্রভাবে এই ভরকে কেন্দ্র করে নক্ষত্রগুলো গ্যালাক্সির চারদিকে পরিভ্রমণ করে [চিত্র ১১.২]। যেহেতু মহাকর্ষ বল কেন্দ্রের নিকটে বেশি, তাই কেন্দ্রের কাছাকাছি ঘূর্ণায়মান নক্ষত্রগুলোর গতিবেগ, কেন্দ্র থেকে অনেক দূরত্বে ঘূর্ণায়মান নক্ষত্রগুলোর গতিবেগের থেকে অনেক বেশি হওয়া উচিৎ। কিন্তু পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, কেন্দ্র থেকে অনেক দূরত্বে গেলেও নক্ষত্রগুলোর ঘূর্ণন গতি বেগ প্রায়, একই থাকে। দূরের নক্ষত্রগুলোকে এত দূরত্বে থাকার পরও এত

চিত্র ১১.২ : গ্যালাক্সিকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান নক্ষত্র মন্ডলী।

বেশি বেগে ঘুরানোর জন্য অনেক শক্তিশালী মহাকর্ষ ক্ষেত্র প্রয়োজন। কিন্তু গবেষণায় দেখা যায়, গ্যালাক্সিতে উপস্থিত দৃশ্যমান ভরের পক্ষে এত বেশি মহাকর্ষ বল তথা শক্তি সরবরাহ করা সম্ভব নয়। এর থেকে বিজ্ঞানীরা ধারণা করলেন, এই মহাবিশ্বে বিপুল পরিমাণ অদৃশ্য ভর রয়েছে যা এই শক্তিশালী মহাকর্ষ সৃষ্টির জন্য দায়ী। এই বিশাল পরিমাণ অদৃশ্য ভরই অদৃশ্য বস্তু বা Dark Matter নামে পরিচিত। বিজ্ঞানীরা ২০০৬ সালে ছায়াপথ সমূহের মধ্যে সংঘর্ষ পর্যবেক্ষণ করে অদৃশ্য বস্তুর ব্যবহার নিশ্চিত হয়েছেন।

১১.২.২ অদৃশ্য শক্তি (Dark Energy)

আমরা জানি মহাবিশ্ব ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। বৃহৎ বিস্ফোরণের পর মহাবিশ্বের সম্প্রাসারণ হার ছিল খুব বেশি।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন, মহাবিস্ফোরণের এত বিলিয়ন বছর পরে মহাকর্ষের প্রভাবে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ হার ধীরে ধীরে কমছে। কিন্তু বিজ্ঞানীদের গবেষণায় দেখা যায়, মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ হার যেখানে কমার কথা, সেখানে তা ধীরে ধীরে বেড়ে চলছে। সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বে তাই এমন একটি মহাবিশ্বের ধারণা করা প্রয়োজন, যাতে ঋণাত্মক চাপবিশিষ্ট (Negative Pressure) বিপুল পরিমাণ শক্তি উপাদান রয়েছে যা শক্তিশালী মহাকর্ষের বিরুদ্ধে কাজ করে মহাবিশ্ব সম্প্রসারণের এই বর্ধিত হারের জন্য দায়ী। এই শক্তিই হচ্ছে অদৃশ্য শক্তি বা Dark Energy। অদৃশ্য শক্তি মহাবিশ্বের প্রসারণ বা সংকোচন দ্বারা প্রভাবিত হয় না। ধারণা করা হয় মহাবিশ্বের ৭০% গঠন করেছে অদৃশ্য শক্তি।

কাজ : অদৃশ্য বস্তু ও অদৃশ্য শক্তির মধ্যে পার্থক্য কর।

অদৃশ্য বস্তু শক্তিশালী মহাকর্ষ ক্ষেত্র সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে। অপরপক্ষে অদৃশ্য শক্তি মহাকর্ষের বিপরীতে কাজ করে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণকে ত্বরিত করে। অর্থাৎ অদৃশ্য বস্তু ও অদৃশ্য শক্তি পরস্পরের বিপরীতে কাজ করে।

১১.২.৩ মহাবিশ্বের জ্যামিতিক গঠন (Geometry of the Universe)

মহাবিশ্বের জ্যামিতিক গঠন বুঝতে হলে মহাবিশ্বের ঘনত্ব প্যারামিটার (Parameter) Ω (ওমেগা) সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। ঘনত্ব প্যারামিটার, Ω হলো মহাবিশ্বের গড় ঘনত্ব, ρ এবং সংকট বা ক্রান্তিঘনত্ব, ρ_c এর অনুপাত।

ঘনত্ব প্যারামিটার, $\Omega = \frac{\text{গড় ঘনত্ব}}{\text{ক্রান্তিঘনত্ব}} = \frac{\rho}{\rho_c}$

$$= \frac{8\pi G\rho}{3H^2}$$

গড় ঘনত্ব বলতে মহাবিশ্বের প্রকৃত ঘনত্বকে বোঝায়।

সংকট ঘনত্ব বলতে এক ঘনমিটারে 5টি হাইড্রোজেন পরমাণুকে ধরা হয়।

এখানে সংকট ঘনত্ব, $\rho_c = \frac{3H^2}{8\pi G} = 9.47\times10^{-27}\ \text{kgm}^{-3}$; এখানে H = হাবল ধ্রুবক এবং G = মহাকর্ষীয় ধ্রুবক।

Ω এর মানের উপর মহাবিশ্বের জ্যামিতিক গঠন নির্ভরশীল। উন্মুক্ত মহাবিশ্বের জন্য $\Omega < 1$, সমতল মহাবিশ্বের জন্য, $\Omega = 1$এবং বদ্ধমহাবিশ্বের ক্ষেত্রে, $\Omega > 1$।

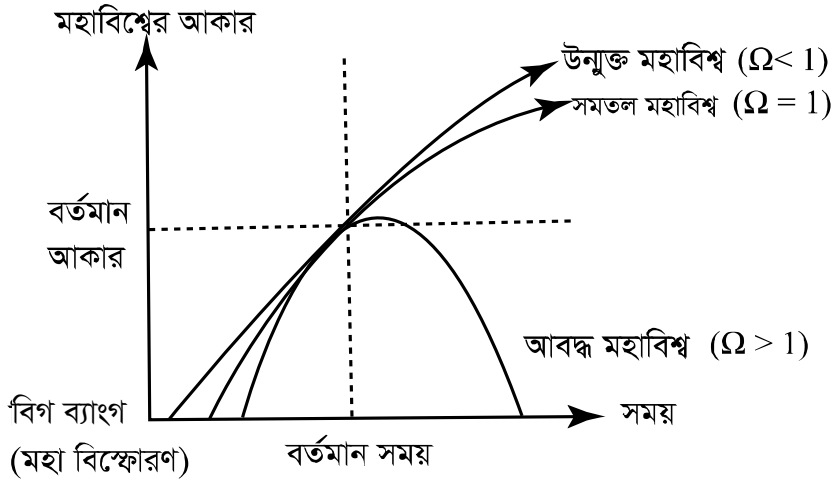

চিত্র ১১.৩ : মহাবিশ্বের আকার বনাম সময় লেখচিত্র।

(ক) উন্মুক্ত মহাবিশ্ব (Open Universe) : যদি মহাবিশ্বের গড় ঘনত্ব, সংকট ঘনত্বের চেয়ে কম হয় ($\Omega < 1$) তাহলে বস্তুসমূহের মহাকর্ষীয় আকর্ষণ বল এর প্রসারণকে থামাতে পারবে না। তার ফলে অনন্ড় কাল ধরে মহাবিশ্ব প্রসারিত হতে থাকবে, কখনও সংকুচিত হবে না। তখন এটিকে উন্মুক্ত মহাবিশ্ব বলা হয়। উন্মুক্ত মহাবিশ্বের জ্যামিতিক আকৃতি হবে অধিবৃত্তাকার।

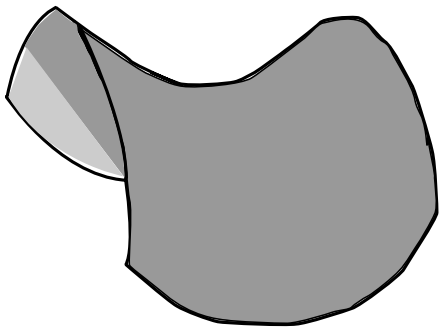

চিত্র ১১.৪ : উন্মুক্ত মহাবিশ্ব।

চিত্র ১১.৫ : সমতল মহাবিশ্ব।

(খ) সমতল মহাবিশ্ব (Flat Universe) : মহাবিশ্বের গড় ঘনত্ব যদি সংকট ঘনত্বের সমান হয় ($\Omega = 1$) তাহলে মহাকর্ষীয় আকর্ষণ প্রসারণের কাছে অল্পের জন্য পরাজিত হবে। ফলে প্রসারণ একেবারে থেমে যাবে না, শুধু ধীর গতিতে অনন্ড়কাল ধরে প্রসারিত হতে থাকবে। এ ক্ষেত্রে প্রসারণজনিত ধাবমান সবকিছু সোজা পথে চলতে থাকবে। স্থান হবে অসীম সমতল অর্থাৎ বক্রতাশূন্য। তখন এটিকে বলা হয় সমতল মহাবিশ্ব। সমতল মহাবিশ্বের জ্যামিতিক আকৃতি হবে সমতল।

(গ) বদ্ধ মহাবিশ্ব (Closed Universe) : যদি মহাবিশ্বের গড় ঘনত্ব সংকট ঘনত্ব অপেক্ষা বেশি হয় ($\Omega > 1$) তাহলে মহাকর্ষীয় আকর্ষণ বল মহাবিশ্বের সম্প্রসারণকে পরাজিত করে ফেলবে এবং মহাবিশ্ব সংকুচিত হয়ে আদি অবস্থা ফিরে পাবে।

যদি মহাবিশ্ব আবার ছোট হয়ে তার আদি বিন্দুতে ফিরে যায়, তবে একে বলা হয় বদ্ধ মহাবিশ্ব। বদ্ধ মহাবিশ্বের জ্যামিতিক আকৃতি হবে গোলক আকৃতির।

মহাবিশ্বের চূড়ান্ড় পরিণতি কি হতে যাচ্ছে তা নির্ভর করে প্রধানত এর জ্যামিতিক আকৃতি ও বিদ্যমান অদৃশ্য শক্তির ওপর। এ দুটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে মহাবিশ্বের চূড়ান্ড় পরিণতি সম্পর্কে কয়েক ধরনের তত্ত্ব আছে;

যেমন- মহা হিমায়ন অথবা তাপীয় মৃত্যু, বিগ রিপ, মহা সংকোচন ইত্যাদি। এগুলো সম্বন্ধে নিচে আলোচনা করা হলো।

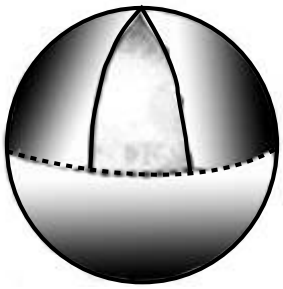

চিত্র ১১.৬ : বদ্ধ মহাবিশ্ব।

১১.২.৪ মহা হিমায়ন (Big Freeze) অথবা তাপীয় মৃত্যু (Heat Death) : মহাবিশ্বের ঘনত্ব যদি সংকট ঘনত্বের সমান অথবা কম হয় এবং তাতে যদি যথেষ্ট পরিমাণ অদৃশ্য শক্তি না থাকে, তবে এক সময় মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ ধীর হয়ে যাবে, তবে কখনই শেষ হবে না। মহাবিশ্ব যতই প্রসারিত হবে, তত তার ঘনত্ব কমতে থাকবে এবং এর ফলে নতুন কোনো নক্ষত্র সৃষ্টি হবে না। এর ফলে মহাবিশ্বের গড় তাপমাত্রা অসমভাবে পরম শূন্যের দিকে ধাবিত হবে এবং মহা হিমায়ন অবস্থার সৃষ্টি হবে। এ সময় কৃষ্ণ গহ্বরসমূহ স্বতঃবাষ্পীভূত হবে। মহাবিশ্বের এনট্রপি বাড়তে বাড়তে এমন একটি বিন্দুতে পৌঁছাবে যখন এ থেকে কার্যকরী কোনো শক্তি পাওয়া যাবে না। এ অবস্থাকে মহাবিশ্বের তাপীয় মৃত্যু বলা হয়।

১১.২.৫ বিগ রিপ (Big Rip) : মহাবিশ্বে অদৃশ্য শক্তির পরিমাণ যদি খুব বেশি হয়, তখন এর সম্প্রসারণের ত্বরণ আরো বেড়ে যাবে এবং এই ক্রমবর্ধমান ত্বরণ এত বেশি হবে যে মহাবিশ্বের গ্যালাক্সি থেকে শুর" করে যত রকম বস্তু রয়েছে তা ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর পর্যায়ে ভেঙ্গে গিয়ে মৌলিক কণা ও বিকিরণে বিশিণ্টষ্ট হয়ে যাবে এবং এই কণাগুলো পরস্পর থেকে অনেক দূরে সরে যাবে। এরূপ অবস্থায় অদৃশ্য শক্তি ও সম্প্রসারণ হার অসীম হবে। মহাবিশ্ব তখন অনন্যতা বা

সিঙ্গুলারিটিতে পৌঁছুবে এবং আমাদের এই পরিচিত মহাবিশ্বের সমাপ্তি ঘটবে। এই অনন্যতার সময় যে কোনো ধরনের বল, তা সে যতই প্রবল হোক না কেন, পদার্থের উপর তার কোনো প্রভাবই থাকবে না। মহাবিশ্বের সবকিছুই পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, একে বিগ রিপ (Big Rip) বা মহাবিচ্ছেদ নামে অভিহিত করা হয়।

১১.২.৬ মহাসংকোচন (Big Crunch)

এই তত্ত্ব মতে মহাবিশ্বের গড় ঘনত্ব এর সম্প্রসারণকে বন্ধ করার জন্য যথেষ্ট। অদৃশ্য শক্তির পরিমাণ যদি বেশি না হয়, তবে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ কমতে কমতে এক সময় তার সম্প্রসারণ বন্ধ হয়ে যাবে এবং তা সংকুচিত হতে শুরু করবে। আর সংকুচিত হতে হতে গোটা মহাবিশ্ব এক মাত্রাহীন সিঙ্গুলারিটিতে বিলীন (Collapse) হবে। অন্য একটি তত্ত্বে ধারণা করা হয়, মহাসংকোচনের পর পুনরায় আবার মহাবিস্ফোরণ সংঘটিত হবে। তারপর আবার মহাসংকোচন, অর্থাৎ এই চক্রের পুনরাবৃত্তি চলতেই থাকবে।

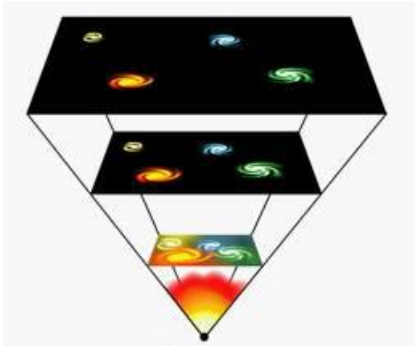

চিত্র ১১.৭ : মহা সংকোচন। উলম্ব অক্ষকে ধনাত্মক অথবা ঋণাত্মক সময় অক্ষ বিবেচনা করা হয়।

মহাবিশ্বের এই ধারণাকে ছন্দিত মহাবিশ্ব (Oscillating Universe) মডেল বলে।

মহাবিশ্বের অন্তিম পরিণতি নিয়ে দেয়া এ সকল তত্ত্বে অদৃশ্য শক্তির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অথচ অদৃশ্য বস্তু ও অদৃশ্য শক্তির অস্তিত্ব এখনও তত্ত্বীয় ধারণা। অন্যদিকে বিগ ব্যাংগ এবং ছন্দিত মডেলে সুপার পরমাণু গঠনের কারণ বা রহস্য বর্ণনা করতে পারে না। এ বিষয়গুলো নিয়ে বিজ্ঞানীরা নিরন্তর গবেষণা করে যাচ্ছেন।

১৯১৬ সালে আলবার্ট আইনস্টাইন সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রণয়ন করার পর গবেষণায় দেখা যায় যে, মহাবিশ্বের চূড়ান্ত পরিণতি সম্ভব। সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের বিভিন্ন সমীকরণের সম্ভাব্য সমাধান মহাবিশ্বের চূড়ান্ত পরিণতির ইঙ্গিত প্রদান করে। আলেকজেন্ডার ফ্রিডম্যান (Alexander Friedman) এই ধরনের কিছু সমাধান প্রস্তাব করেন ১৯২১ সালে। এগুলোর মধ্যে একটি হলো মহাবিশ্ব অনন্যতা (Singularity) থেকে শুরু হয়ে অনবরত প্রসারিত হচ্ছে, যাকে বলা হয় বৃহৎ বিস্ফোরণ (Big Bang)। ১৯৩১ সালে বিজ্ঞানী এডুইন হাবল (Edwin Huble) দেখান যে, গ্যালাক্সিগুলো একে অপর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে অর্থাৎ মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে।

সার-সংক্ষেপ :

মহাবিশ্বের জ্যামিতিক গঠন : মহাবিশ্বের জ্যামিতিক গঠন বুঝতে হলে মহাবিশ্বের ঘনত্ব প্যারামিটার Ω (ওমেগা) সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। ঘনত্ব প্যারামিটার, Ω হলো মহাবিশ্বের গড় ঘনত্ব, ρ এবং সংকট বা ক্রান্তি ঘনত্ব, ρ_c এর অনুপাত।

উন্মুক্ত মহাবিশ্ব : যদি মহাবিশ্বের গড় ঘনত্ব, সংকট ঘনত্বের চেয়ে কম হয় ($\Omega < 1$) তাহলে বস্তুসমূহের মহাকর্ষীয় আকর্ষণ বল এর প্রসারণকে থামাতে পারবে না। তার ফলে অনন্ত কাল ধরে মহাবিশ্ব প্রসারিত হতে থাকবে, কখনও সংকুচিত হবে না। তখন এটিকে উন্মুক্ত মহাবিশ্ব বলা হয়।

বদ্ধ মহাবিশ্ব : যদি মহাবিশ্বের গড় ঘনত্ব সংকট ঘনত্ব অপেক্ষা বেশি হয় ($\Omega > 1$) তাহলে মহাকর্ষীয় আকর্ষণ বল মহাবিশ্বের সম্প্রসারণকে পরাজিত করে ফেলবে এবং মহাবিশ্ব সংকুচিত হয়ে আদি অবস্থা ফিরে পাবে। যদি মহাবিশ্ব আবার ছোট হয়ে তার আদি বিন্দুতে ফিরে যায়, তবে একে বলা হয় বদ্ধ মহাবিশ্ব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১১.২

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১। আবদ্ধ মহাবিশ্বের জন্য ঘনত্ব প্যারামিটার Ω -এর মান কোনটি?

(ক) $\Omega = 0$ (খ) $\Omega > 1$ (গ) $\Omega < 1$ (ঘ) $\Omega = 1$

২। মহাবিশ্বের অদৃশ্য শক্তির পরিমাণ যদি খুব বেশি হয়, তাহলে কোনটি সংঘঠিত হয়?

(ক) মহাহিমায়ন (খ) বিগ রিপ (গ) মহাসংকোচন (ঘ) অপরিবর্তিত থাকবে

পাঠ-১১.৩ : মহাবিশ্বের মূল বস্তু ও ঘটনা

Core Matter and Events of the Universe

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মহাবিশ্বের মূল বস্তু ও ঘটনা বর্ণনা করতে পারবেন।

১১.৩.১ মহাবিশ্বের মূল বস্তু ও ঘটনা বর্ণনার পূর্বে মৌলিক কণা সম্বন্ধে ধারণা থাকা দরকার। কারণ সকল বস্তুই এই মৌলিক কণার বিভিন্ন সমন্বয়ে গঠিত। এই মৌলিক কণার মধ্যে রয়েছে কণা ও প্রতিকণা।

কণা (Particle) ও প্রতি কণা (Antiparticle) : প্রতি কণা হলো এমন কণিকা যার ভর এবং স্পিন অন্য একটি কণিকার সমান, কিন্তু যার চার্জ, বেরিয়ন সংখ্যা, লেপ্টন সংখ্যা অন্য কণিকাটির সমমানের অথচ বিপরীতধর্মী। বলবাহী কণা ছাড়া সকল কণারই প্রতি কণা রয়েছে। ইংরেজ পদার্থবিদ পল ডিরাক গাণিতিকভাবে প্রমাণ করেন যে, ইলেকট্রনের স্পিন $\frac{1}{2}$। এরপর তিনি ইলেকট্রনের বিপরীত কণা পজিট্রন (এন্টিইলেকট্রন, e^+) আবিষ্কার করেন এবং এর জন্য পল ডিরাক ১৯৩২ সালে নোবেল পুরস্কার পান।

যখন কণা ও প্রতিকণা মিলিত হয় তখন তারা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে নির্ভেজাল শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং বিপুল পরিমাণ শক্তির উদ্ভব ঘটে। তবে সাধারণ পরমাণুতে কণা ও প্রতিকণা কখনও একসাথে থাকে না। কণাগুলো যেমন পদার্থ (Matter) গঠন করে তেমনি প্রতিকণাগুলো মিলে প্রতিপদার্থ (Anti Matter) তৈরি করে।

মহাবিশ্বের সকল কণাকে দুভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথাঃ (ক) ফার্মিওন ও (খ) বোসন। এদের সম্পর্কে নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

(ক) ফার্মিওন (Fermion) : মহাবিশ্বের সকল পদার্থ এই কণিকা দ্বারা গঠিত। এদের স্পিন $\frac{1}{2}$। এরা পাউলির (Pauli) বর্জন নীতি মেনে চলে অর্থাৎ কখনই একটি পরমাণুতে দুটি ভিন্ন কণার সকল বৈশিষ্ট্য এক হতে পারে না। অন্তত পক্ষে স্পিনের দিক থেকে হলেও বিপরীত হবে। এদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিকণা আছে। ফার্মিওন কণা আবার দু'রকমের (১) কোয়ার্ক ও (২) লেপ্টন।

১। কোয়ার্ক (Quark) : কোয়ার্ক পদার্থ গঠনের অন্যতম মৌলিক কণিকা। সকল বস্তু প্রোটন ও নিউট্রন দ্বারা গঠিত। আর এই প্রোটন ও নিউট্রন গঠিত হলো কোয়ার্ক দিয়ে। দুটি আপ কোয়ার্ক ও একটি ডাউন কোয়ার্ক নিয়ে প্রোটন এবং দুটি ডাউন এবং একটি আপ কোয়ার্ক নিয়ে নিউট্রন গঠিত। কোয়ার্ক মূলত ৬ টি। এগুলো হলো আপ (u) ও

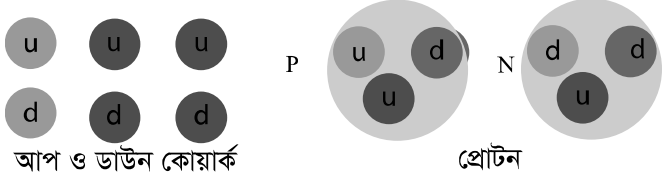

আপ ও ডাউন কোয়ার্ক (ক) প্রোটন (খ)

চিত্র ১১.৮ : কোয়ার্ক ।

ডাউন (d), চার্ম (c) ও স্ট্রেঞ্জ (s) এবং টপ (t) ও বটম (b)। এদের প্রত্যেকের আবার তিনটি করে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ (Colour) রয়েছে। এই বর্ণ বাস্ড়বের রং নির্দেশ করে না বরং কণাগুলোর ভিন্ন ভিন্ন কোয়ান্টাম অবস্থা নির্দেশ করে। কোয়ার্কগুলোর চার্জের পরিমাণ ভগ্নাংশ; যেমন, $\frac{2}{3}$, $\frac{-1}{3}$ । তবে তারা সব সময় এমনভাবে থাকে যেন নীট চার্জ পূর্ণসংখ্যা হয়।

কোয়ার্ক সব সময় দলবদ্ধ অবস্থায় থাকে। কোয়ার্কের এক একটি দলকে বলে হ্যাড্রন (Hadron)। তিনটি কোয়ার্ক নিয়ে যে হ্যাড্রন গঠিত হয় তাদেরকে বলা হয় বেরিয়ন (Baryon)। যেমন- প্রোটন, নিউট্রন বেরিয়ন কণা। একটি কোয়ার্ক ও তার এন্টিকোয়ার্ক নিয়ে যে হ্যাড্রন হয় তাদের বলা হয় মেসন (Meson) । যেমন; π মেসন, k মেসন ইত্যাদি।

২। লেপ্টন (Leptons) : ছয় প্রকার লেপ্টন কণিকা রয়েছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে উলেণ্ঢখযোগ্য হচ্ছে ইলেকট্রন। আর বাকি দুটো মিউওন। একটি মিউ মিউওন (μ) ও অপরটি টাউ মিউওন (τ)। আর এই তিনটির সাথে জোড়ায় রয়েছে ইলেকট্রন নিউট্রিনো (ν_ε), মিউ নিউট্রিনো (ν_μ) এবং টাউ নিউট্রিনো (ν_τ)। নিউট্রিনো (ν) হচ্ছে তড়িৎ চার্জহীন, দুর্বল সক্রিয় এবং ক্ষুদ্র ভরের মৌলিক কণিকা। মিউ মিউওন ও টাউ মিউওন যথেষ্ঠ ভারী, তাদের প্রকৃতিতে সচরাচর পাওয়া যায় না। সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথেই ভেঙ্গে অপেক্ষাকৃত ছোট লেপ্টন তৈরি করে।

(খ) বোসন (Boson) : মৌলিক বলগুলো কাজ করে কণার আদান-প্রদানের মাধ্যমে। এই বলবাহী কণাগুলোই হচ্ছে বোসন। এদের স্পিন পূর্ণসংখ্যা 0, 1 ইত্যাদি। বোসন কণা পাউলির বর্জন নীতি মানে না। এদের আলাদা প্রতিকণা নেই। এরা নিজেরাই নিজেদের প্রতিকণা। স্ট্যান্ডার্ড মডেল অনুসারে বোসন কণাগুলো দু'ধরনের। (i) গেজ বোসন (Gauge Boson) ও (ii) হিগস বোসন (Higgs Boson)।

(i) গেজ বোসন (Gauge Boson): এদের স্পিন হলো 1। এই কণাগুলো হলো- গণ্ঢুওন (g), ফোটন (γ) এবং W ও Z বোসন।

গণ্ঢুওন : গণ্ঢুওন কণা হলো সবল নিউক্লিয় বলবাহী কণা। এর নিশ্চল ভর শূন্য।

ফোটন : এই কণা তাড়িতচৌম্বক বল বহন করে। এর নিশ্চল ভর শূন্য।

W ও Z বোসন : W^+, W^- এবং Z° এই তিনটি বোসন কণা দুর্বল নিউক্লিয় বলের বাহক। এ কণাগুলোর ভর আছে।

(ii) হিগস বোসন (Higgs Boson): হিগস বোসন এর স্পিন 0, তবে এর ভর আছে। হিগস বোসন বুঝতে হলে হিগস ক্ষেত্র সম্বন্ধে জানতে হবে। হিগস ক্ষেত্র একটি তাত্ত্বিক বলক্ষেত্র যা সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। এই ক্ষেত্রের কাজ হলো মৌলিক কণাগুলোকে ভর প্রদান করা। যখন কোনো ভরহীন কণা হিগস ক্ষেত্রে প্রবেশ করে তখন তা ধীরে ধীরে ভর লাভ করে। ফলে তার চলার গতি ধীর হয়ে যায়। হিগস বোসনের মাধ্যমে ভর কণাতে স্থানান্ড়রিত হয়। হিগস ক্ষেত্র ভর সৃষ্টি করে না, তা কেবল ভর স্থানান্ড়রিত করে হিগস বোসনের মাধ্যমে। এই হিগস বোসনই ঈশ্বর কণা (God's Particle) নামে পরিচিত।

গ্র্যাভিটন (Graviton): কোয়ান্টাম তত্ত্ব মতে, গ্র্যাভিটন নামক এক ধরনের বোসন কণার আদান-প্রদানের মাধ্যমে মহাকর্ষ বল কাজ করে। গ্র্যাভিটনের প্রতিকণা সে নিজেই এবং স্পিন 2। ভরশূন্য এবং চার্জ নিরপেক্ষ এই কণা এখনও স্ট্যান্ডার্ড মডেলে স্থান পায়নি।

১১.৩.২ নক্ষত্রের জীবনচক্র (Life Cycle of Star)

শুর"তে নক্ষত্রে ছিলো আন্ড়ঃনাক্ষত্রিক ধূলিকণা ও গ্যাসের এক বিশাল মেঘ হিসেবে। মহাকর্ষ বলের প্রভাবে ধূলিকণা ও গ্যাসের এই বিশাল মেঘ সংকুচিত হয়। সংকোচনের সময় উচ্চ চাপ ও উচ্চ তাপমাত্রার সৃষ্টি হয়। তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে যখন কয়েক মিলিয়ন কেলভিন হয়, তখন তাপ-নিউক্লিয় বা নিউক্লিয় ফিউশন বিক্রিয়া সংঘটিত হয়, ফলশ্র"তিতে বিপুল পরিমাণ শক্তি নির্গত হয়। ফলে পদার্থের গোলকটি দীপ্তি ছড়ায় এবং নক্ষত্রের জন্ম হয়। নক্ষত্রের বিবর্তনে এটি হলো আদি ধাপ বা পর্ব। এই ধাপে বামন নক্ষত্র পাওয়া যায়। মোট নক্ষত্রের শতকরা 90 ভাগ হলো এই বামন নক্ষত্র (Dwarf star)। আমাদের সূর্য বর্তমানে এই ধাপে আছে।

নক্ষত্রের কেন্দ্রীয় মূলবস্তুতে যতক্ষণ পর্যন্ড় হাইড্রোজেন জ্বালানি থাকে, ততক্ষণ নক্ষত্রে তাপ নিউক্লিয় বিক্রিয়া ঘটতে থাকে। হাইড্রোজেন নিঃশেষ হয়ে গেলে নক্ষত্রের মূলবস্তু সংকুচিত হতে থাকে কিন্তু বহিঃস্থ অংশ তখনও প্রসারিত হতে থাকে। ফলে নক্ষত্রের ব্যাসার্ধ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং একই সাথে পৃষ্ঠের তাপমাত্রা হ্রাস পেতে থাকে। নক্ষত্রের বিবর্তনের এই ধাপকে বলা হয় দানব নক্ষত্র (Giant Star) বা অতি দানব নক্ষত্র (Super giant star)। এসব নক্ষত্রের ব্যাসার্ধ সূর্যের ব্যাসার্ধের 50% থেকে 200 গুণ পর্যন্ড় হয়। এখন থেকে 5 বিলিয়ন (500 কোটি) বছর পরে আমাদের সূর্য এই ধাপে পৌঁছাবে।

নক্ষত্র বামন ধাপের চেয়ে অনেক কম সময় দানব ধাপে থাকে। প্রায় এক মিলিয়ন (দশ লক্ষ) বছর পর দানব নক্ষত্র শীতল হতে থাকে, ফলে নক্ষত্রটি সংকুচিত হতে থাকে। এর পরে এই নক্ষত্রের কী ঘটবে তা নির্ভর করে এর আদি বা মূল ভরের উপর।

১১.৩.৩ শ্বেত বামন নক্ষত্র (White dwarf star) : দুই সৌর ভরের চেয়ে কম ভরের কোনো নক্ষত্র যখন সংকুচিত হতে থাকে, তখন এর শক্তি মুক্ত হতে থাকে। কিন্তু এটি এমন একটি ধাপে বা অবস্থায় পৌঁছায় যে এটি এর বহিঃস্থ আস্ড়রণকে ছুঁড়ে দেয়। ফলে হঠাৎ করে প্রচুর পরিমাণ শক্তি নির্গত হয় যা নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্য বাড়িয়ে দেয়। এই ধাপে নক্ষত্রটি এত উজ্জ্বল হয় যে, খালি চোখেও দেখা যায়। এটি এখন নোভা নক্ষত্র (Nova Star) এবং একটি নতুন নক্ষত্র। এই বিস্ফোরণে যা অবশিষ্ট থাকে তাকে বলা হয় শ্বেত বামন নক্ষত্র (White dwarf star)। নিউক্লিয় ফিউশন বিক্রিয়ায় শক্তি উৎপাদনের জন্য কোনো হাইড্রোজেন বা হিলিয়াম এতে থাকে না। এরা খুব উত্তপ্ত বিধায় সাদা আলো নিঃসরণকারী এবং অত্যধিক সংকোচনের ফলে এদের আকার খুবই ছোট হয়। এদের ঘনত্ব তাই খুবই বেশি থাকে। যেহেতু শ্বেত বামন তারায় শক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় না, তাই একটি শ্বেত বামন তারা সময়ের সাথে সাথে কেবল শীতলই হতে থাকবে, আলো আস্ড়ে আস্ড়ে স্ড়িমিত হতে হতে 'কালো বামন' তারায় তার শেষ পরিণতি ঘটবে। শ্বেত বামন নক্ষত্রের জন্য ভরের সীমা হলো 1.4 সৌর ভর। ১৯৩৫ সালে ভারতীয় বিজ্ঞানী সুব্রামনিয়াম চন্দ্রশেখর মাত্র ১৯ বছর বয়সে তাত্ত্বিকভাবে দেখান যে, কোনো নক্ষত্রের ভর যদি 1.4 সৌরভরের চেয়ে বেশি হয়, তখন এটি শ্বেতবামন নক্ষত্র হিসেবে স্থায়ীত্ব লাভ করতে পারবে না। নক্ষত্রের এই ভরকে চন্দ্রশেখর সীমা বলে। নক্ষত্রের ভর চন্দ্রশেখর সীমার চেয়ে বেশি হলে, এটি নিউট্রন স্টার বা **কৃষ্ণ** গহবরে রূপান্ড়রিত হবে।

১১.৩.৪ নিউট্রন স্টার (Neutron Star)

একটি নক্ষত্রের ভর যদি চন্দ্রশেখর সীমা অপেক্ষা বেশি হয় অর্থাৎ 1.4 থেকে তিন সৌর ভরের মধ্যে নক্ষত্রের ভর হলে সংকোচনের সময় এটি এমন একটি ধাপে পৌঁছায় যে, এটি এর বহিঃস্থ আস্ড়রণ ছুঁড়ে দিয়ে অত্যন্ড় উজ্জ্বল হয়ে যায়। একে বলা হয় **সুপারনোভা** (Super Nova)। নক্ষত্রটি যখন সুপারনোভা হিসেবে বিস্ফোরিত হয়, তখন এর মূলবস্তুর চাপ এত

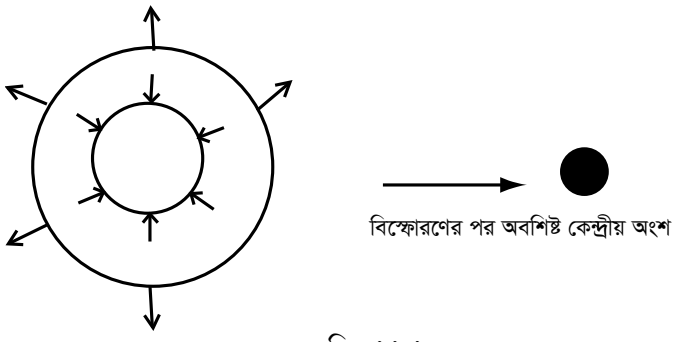

চিত্র ১১.৯

বেশি হয় যে, প্রোটন ও ইলেকট্রন একত্রিত হয়ে নিউট্রন গঠন করে। তাই একে বলা হয় নিউট্রন স্টার। অতি উচ্চ চৌম্বকক্ষেত্রের কারণে নিউট্রন স্টার নির্দিষ্ট সময় অন্ড়র অন্ড়র বেতার স্পন্দন (Radio pulse) নির্গমন করে বলে একে পালসার বলে। নক্ষত্রের ভর 1.4 থেকে 3 সৌরভরের মধ্যে থাকলেই কেবল এটি নিউট্রন নক্ষত্রে পরিণত হতে পারে। নক্ষত্রের ভর 3.2 সৌরভরের চেয়ে বেশি হলে তখন এটি কৃষ্ণগহবর বা কোয়ার্ক নক্ষত্রে পরিণত হবে।

১১.৩.৫ কৃষ্ণবিবর (Black hole)

তিন সৌর ভরের সমান বা বেশি ভরের নক্ষত্রের সুপার নোভা বিস্ফোরণের পর এর অন্ড়র্বস্তু অনির্দিষ্টভাবে সংকুচিত হতে থাকে। সংকোচনের কারণে আয়তন প্রায় শূন্য এবং ঘনত্ব প্রায় অসীম হওয়ায় মহাকর্ষ ক্ষেত্র এমন প্রবল হয় যে, এ জাতীয় বস্তু থেকে এর মহাকর্ষকে কাটিয়ে কোনো প্রকার আলো বা সংকেতও বেরিয়ে আসতে পারে না। তাই বস্তুটিকে আর দেখা যায় না। নক্ষত্রের এই অবস্থাকে বলা হয় কৃষ্ণবিবর (Black hole)। বাস্ড়বে g-এর মান এত বেশি হয় যে, এমনটি

ফোটন কণাও এর পৃষ্ঠ থেকে মুক্ত হতে বা বেরিয়ে আসতে পারে না। ১৯৬৯ সালে জন হুইলার নামক জনৈক মার্কিন বিজ্ঞানী কৃষ্ণবিবর আবিষ্কার করেন।

১১.৩.৬ সোয়ার্জস্কাইল্ড ব্যাসার্ধ

M ভরের কোনো বস্তু তখনই কৃষ্ণবিবর হিসেবে কাজ করবে যখন এর ব্যাসার্ধ একটি নির্দিষ্ট সংকট ব্যাসার্ধের সমান বা কম হবে। মুক্তি বেগ v এর সমীকরণে v এর পরিবর্তে c বসালে আমরা এই সংকট ব্যাসার্ধ পেতে পারি। এই সংকট ব্যাসার্ধ বের করার জন্য ১৯২৬ সালে কার্ল সোয়ার্জস্কাইল্ড (Karl Schwarzchild) আইনস্টাইনের সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্ব ব্যবহার করেন। ফলে সমীকরণটি দাঁড়ায়,

$$c = \sqrt{\frac{2GM}{R_S}} \qquad [\ \therefore \text{ মুক্তিবেগ, } v = \sqrt{\frac{2GM}{R}}\ ]$$

এখানে c আলোর দ্রুতি, R_S সংকট ব্যাসার্ধ। সংকট ব্যাসার্ধ R_S কে সোয়ার্জস্কাইল্ড ব্যাসার্ধ বলে। R_S এর জন্য সমাধান করে পাই,

$$R_S = \frac{2GM}{c^2}$$

M ভরবিশিষ্ট অঘূর্ণনশীল কোন গোলকীয় বস্তুর ব্যাসার্ধ যদি R_S হয় তাহলে কোনো কিছুই (আলোও) এই বস্তুপৃষ্ঠ হতে মুক্ত হতে পারবে না এবং বস্তুটি কৃষ্ণবিবর হিসেবে কাজ করবে। প্রত্যেক কৃষ্ণ বিবরের একটি ঘটনা দিগন্ড় (Event horizon) থাকে। ঘটনা দিগন্ড় হলো কৃষ্ণ বিবরের চারপাশের যে অঞ্চল থেকে কোনো প্রকার বিকিরণ বা সংকেত বেরিয়ে আসতে পারে না তার সীমানা। অর্থাৎ

কৃষ্ণ বিবরকে ঘিরে R_S ব্যাসার্ধের গোলকের পৃষ্ঠকে বলা হয় ঘটনা দিগন্ড়। সুতরাং কৃষ্ণ বিবরের কেন্দ্র থেকে ঘটনা দিগন্ড় পর্যন্ড় দূরত্বকে সোয়ার্জস্কাইল্ড ব্যাসার্ধ বলা হয়।

একটি নির্দিষ্ট ভরের গোলকাকৃতি বস্তু যে ব্যাসার্ধ প্রাপ্ত হলে কৃষ্ণবিবর হিসেবে কাজকরে, তাকে সোয়াজস্কাইলড ব্যাসার্ধ বলে।

১১.৩.৭ কোয়াসার (Quasar)

মহাবিশ্বে এ যাবৎ কালের আবিস্কৃত সবচেয়ে বিস্ময়কর বস্তু সম্ভবত কোয়সার। কোয়াসার হলো মহাবিশ্বের সবচেয়ে উজ্জ্বল বস্তু। একটি কোয়সারের মোট শক্তির পরিমাণ একটি সম্পূর্ণ গ্যালাক্সির শক্তির চেয়ে প্রায় 100 গুণ বেশি। অথচ একটি কোয়াসারের ব্যাপ্তি আমাদের সৌরজগতের প্রায় দ্বিগুণের মতো। বিজ্ঞানীদের অনেকেই মনে করেন কোয়াসার হলো গ্যালাক্সির কেন্দ্রে অবস্থিত ঘূর্ণায়মান বণ্যাক হোল যা ক্রমাগত সন্নিকটবর্তী নক্ষত্রসমূহকে গ্রাস করে চলছে। সুতরাং কোয়াসারের শক্তির উৎস বণ্যাক হোল কর্তৃক নক্ষত্র গলধঃকরণ হতে পারে। কোয়াসার এখনও মহাবিশ্বের অতি রহস্যময় এক বস্তু। তবে কোয়াসারের যে বৈশিষ্ট্যগুলো এখন পর্যন্ড় জানা সম্ভব হয়েছে তাদের মধ্যে উলেণ্টখযোগ্য হলো: কোয়াসার দেখতে নক্ষত্রের মতো, তাদের রং নীলাভ, কতকগুলো কোয়াসার তীব্র বেতার বিকিরণের উৎস, কোয়াসারের লোহিত সরণ খুবই বেশি প্রভৃতি।

চিত্র ১১.১০

সার-সংক্ষেপ :

ফার্মিওন : মহাবিশ্বের সকল পদার্থ এই কণিকা দ্বারা গঠিত। এদের স্পিন $\frac{1}{2}$ । এরা পাউলির (Pauli) বর্জন নীতি মেনে চলে।

বোসন : মৌলিক বলগুলো কাজ করে কণার আদান-প্রদানের মাধ্যমে। এই বলবাহী কণাগুলোই হচ্ছে বোসন। এদের স্পিন পূর্ণসংখ্যা 0, 1 ইত্যাদি।
গ্র্যাভিটন : কোয়ান্টাম তত্ত্ব মতে, গ্র্যাভিটন নামক এক ধরনের বোসন কণার আদান-প্রদানের মাধ্যমে মহাকর্ষ বল কাজ করে। গ্র্যাভিটনের প্রতিকণা সে নিজেই এবং স্পিন 2।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১১.৩

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন :
সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন
১। ঈশ্বর কণা নামে পরিচিত–
(ক) হিগস্-মেসন (খ) হিগস্- বোসন (গ) লেপটন কণা (ঘ) কোয়ার্ক কণা
২। যে সকল বিনিময় কণা মহাকর্ষীয় মিথস্ক্রিয়ার মধ্যস্থতাকারী সেগুলো হল–
(ক) গ্রাভিটন (খ) ফোটন (গ) হেড্রন (ঘ) গণ্ডুওন

পাঠ-১১.৪ : মহাকাশ পর্যবেক্ষণে ব্যবহৃত আধুনিক যন্ত্রপাতি

Modern Instruments Used for Observation of the Universe

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- রেডিও টেলিস্কোপের নীতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- গামা-রে ও এক্স-রে টেলিস্কোপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১১.৪.১ রেডিও টেলিস্কোপ

Radio Telescope

যে যন্ত্রের সাহায্যে তারকা, গ্যালাক্সি, কোয়াসার এবং অন্যান্য নভোমন্ডলীয় বস্তু থেকে প্রাকৃতিকভাবে নির্গত তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গ (রেডিও তরঙ্গ) সনাক্ত ও পরিমাপ করে ঐ সব বস্তু সম্পর্কে অনুসন্ধান চালানো হয় তাকে রেডিও টেলিস্কোপ বলে।

আমাদের মহাবিশ্বে নক্ষত্র, গ্যালাক্সিসমূহ পৃথিবী থেকে অনেক অনেক দূরে অবস্থিত। ঐসব নক্ষত্র বা গ্যালাক্সিগুলো সম্পর্কে আমরা উপাত্ত সংগ্রহ করতে চাই। কিন্তু সব নক্ষত্র বা গ্যালাক্সি আলোকীয় দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা যায় না। কিন্তু এসব মহাজাগতিক বস্তু থেকে নির্গত তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গ বিশেণ্ডষণ করে আমরা নক্ষত্র, সৌরজগত বা মহাবিশ্ব সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারি।

চিত্র ১১.১১

বেতার দূরবীক্ষণ যন্ত্র বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞানে ব্যবহৃত এক ধরণের দিকনির্ভর বেতার অ্যান্টেনা, যা একই সঙ্গে কৃত্রিম উপগ্রহ ও মহাশূন্য সন্ধানী যান থেকেও উপাত্ত সংগ্রহ করতে পারে।

মূলনীতি: রেডিও টেলিস্কোপ যে মূলনীতিতে কাজ করে, তাহলো মহাকাশের বিভিন্ন জ্যোতিষ্ক থেকে তাপীয় নিঃসরণ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন রেডিও তরঙ্গ গ্রহণ ও বিবর্ধন করে তা বিশেণ্ডষণ করা। এ যন্ত্রের মৌলিক কার্যনীতি দৃশ্যমান তরঙ্গদৈর্ঘ্যে ব্যবহৃত প্রতিফলক দূরবীক্ষণ যন্ত্রের অনুরূপ। আপতিত তরঙ্গ তা বেতার বা দৃশ্যমান যা-ই হোক না কেন, একটি নিখুঁত দর্পণে বাধাগ্রস্থ হয়ে একটি সাধারণ অভিসারী বিন্দুতে মিলিত হয়।

এক্ষেত্রে প্রতিফলক পৃষ্ঠতল আপতিত তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বৈশিষ্ট্যগুলো বেশ গুর"ত্বপূর্ণ। প্রতিফলক পৃষ্ঠতলের আকৃতি এমন হতে হবে যেন বেতার তরঙ্গগুলো প্রতিফলনের পর অভিসারী বিন্দুতে একই দশায় মিলিত হতে পারে। এজন্য প্রতিফলন বিন্দু থেকে অভিসারী বিন্দু পর্যন্ড় পথের দৈর্ঘ্য পৃষ্ঠতলের বিভিন্ন বিন্দুতে একই হতে হবে। প্রতিফলন পৃষ্ঠতলটি পরাবৃত্ত আকৃতির করে এই শর্ত পূরণ করা হয়। এজন্য আধুনিক বেতার দূরবীক্ষণ যন্ত্রগুলোর প্রতিফলন পৃষ্ঠতল তথা ডিশের আকৃতি পরাবৃত্তীয় হয়ে থাকে।

গঠন: রেডিও টেলিস্কোপ মহাশূন্য হতে আগত রেডিও তরঙ্গসমূহকে সনাক্ত করতে পারে। রেডিও টেলিস্কোপ সাধারণ অপটিক্যাল টেলিস্কোপ হতে অনেক বড় আকারের হয়ে থাকে। কারণ হলো, রেডিও তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তুলনায় বড়। রেডিও টেলিস্কোপের মধ্যে তিনটি প্রধান অংশ থাকে। এগুলো হলো-

(১) রেডিও প্রতিফলক ডিশ- এর কাজ হচ্ছে আপতিত বিকিরণ সংগ্রহ করে একটি বিন্দু অভিসারী করা।

(২) রেডিও বা বেতার এন্টেনা- এটি ফোকাস বিন্দুতে স্থাপন করা হয় এবং প্রতিফলিত তরঙ্গসমূহকে ধারণ করে।

(৩) রেকর্ডার বা তথ্য প্রদর্শনী যন্ত্র- এর কাজ হলো বিবর্ধিত উপাত্তকে বিজ্ঞানীদের বোধগম্য ভাষায় প্রদর্শন করা।

রেডিও দূরবীক্ষণ যন্ত্র ভূমিতে ও কৃত্রিম উপগ্রহে স্থাপন করা যায়। ভূমিতে স্থাপিত এ যন্ত্রের সাহায্যে মহাজাগতিক উৎস থেকে আগত 1 mm থেকে 10 m তরঙ্গদৈর্ঘ্যের রেডিও তরঙ্গ সনাক্ত করা যায়। বেতার যন্ত্রগুলো জনবসতি থেকে দূরে স্থাপন করা হয় যাতে বেতার যন্ত্র, টেলিভিশন, রাডার ইত্যাদি তাড়িতচৌম্বক ব্যতিচারের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা যায়। সেজন্য একে সাধারণত বিস্ড়ীর্ণ সমতল উপত্যকায় স্থাপন করা হয়।

১১.৪.২ কৃত্রিম উপগ্রহ
Artificial Satellite

কৃত্রিম উপগ্রহ হলো এক ধরণের মহাশূন্যযান যা নির্দিষ্ট কক্ষপথ থেকে পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, বা অন্য কোনো গ্রহের চারদিকে আবর্তন করে। ১৯৫৭ সালের ৪ অক্টোবর সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞানীরা স্পুটনিক-১ নামে মহাকাশে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ করেন। বর্তমানে কৃত্রিম উপগ্রহের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে এবং মহাকাশে বিপুল সংখ্যক কৃত্রিম উপগ্রহ বিভিন্ন ধরণের কাজে নিয়োজিত আছে।

কৃত্রিম উপগ্রহ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়। যোগাযোগ (টেলিফোন, রেডিও ও টিভি সম্প্রচার), পরিবেশগত গবেষণা, আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রদান, সামরিক গোয়েন্দাগিরি ও মহাকাশ গবেষণা ইত্যাদি বিভিন্ন কাজে কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবহার করা হয়। আমরা এ অনুচ্ছেদে মহাকাশ গবেষণা তথা জ্যোতিবিজ্ঞান সম্পর্কিত গবেষণার কাজে কৃত্রিম উপগ্রহের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করব।

মূলনীতি: আমরা জানি, একটি কৃত্রিম উপগ্রহ নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। এজন্য কৃত্রিম উপগ্রহের উপর ক্রিয়াশীল কেন্দ্রমুখী বলের প্রয়োজন। কৃত্রিম উপগ্রহের উপর পৃথিবীর অভিকর্ষ বল, প্রয়োজনীয় কেন্দ্রমুখী বল সরবরাহ করে। কৃত্রিম উপগ্রহকে রকেটের সাহায্যে এর নির্দিষ্ট কক্ষপথে স্থাপন করা হয়। কৃত্রিম উপগ্রহকে নির্দিষ্ট উচ্চতায় তুলে ভূ-পৃষ্ঠের সমান্ড়রালে নির্দিষ্ট বেগ দেয়া হয়। তখন কৃত্রিম উপগ্রহটি পৃথিবীর আকর্ষণের প্রভাবে নির্দিষ্ট কক্ষপথে অবিরত ঘুরতে থাকে। কৃত্রিম উপগ্রহের ভর, m এবং পৃথিবীর ভর, M হলে, কৃত্রিম উপগ্রহের বেগ, v হবে-

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}} \quad \text{এখানে, } r=R+h$$

এখানে r হলো পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে কৃত্রিম উপগ্রহের দূরত্ব। এ সমীকরণ থেকে দেখা যায় যে, কৃত্রিম উপগ্রহের বেগ এর ভরের উপর নির্ভরশীল নয়।

আবার কৃত্রিম উপগ্রহের উচ্চতা h হলে,

$$h = \left(\frac{GMT^2}{4\pi^2}\right)^{\frac{1}{3}} - R$$

এখানে T হলো কৃত্রিম উপগ্রহের আবর্তনকাল।

চিত্র : ১১.১২

মহাকাশ পর্যবেক্ষণে কৃত্রিম উপগ্রহ: মহাকাশের মহাজাগতিক বস্তু (Celestial bodies) সম্পর্কে গবেষণার জন্য বিশেষ ধরণের কৃত্রিম উপগ্রহ তৈরি করা হয়। মহাকাশে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনার বাহক (Carrier) হিসেবে কাজ করে বিভিন্ন ধরণের তাড়িতচৌম্বক বিকিরণ। যেমন -বেতার তরঙ্গ, অবলোহিত তরঙ্গ, দৃশ্যমান আলো, অতিবেগুনী রশ্মি, এক্স রশ্মি, গামা রশ্মি ইত্যাদি ঐ সকল বস্তু থেকে বা ঘটনায় নিঃসৃত হয়। পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের গ্যাস, ধূলিকণা, আর্দ্রতা মহাকাশের বস্তু পর্যবেক্ষণে বাধা হিসেবে কাজ করে। নিঃসৃত বিকিরণের প্রধান অংশ ১৮ মাইল পুর" বায়ু স্ড়র দ্বারা শোষিত বা প্রতিফলিত হয়। ফলে পৃথিবী শুধু দৃশ্যমান বিকিরণ ও রেডিও তরঙ্গের সামান্য পরিমাণ গ্রহণ করে। এসব কারণে কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে মহাকাশ পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের উপরে গিয়ে বিশেষ ধরনের টেলিস্কোপ স্থাপন করে মহাজাগতিক বস্তু পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান করা হয়। হাবল টেলিস্কোপ, এক্স-রে টেলিস্কোপ, গামা-রে টেলিস্কোপ এ ধরনের টেলিস্কোপ। ১৯৯০ সালের এপ্রিল মাসে আমেরিকার NASA এর বিজ্ঞানীরা বায়ুমন্ডলের 600 কিলোমিটার উচ্চতায় কৃত্রিম উপগ্রহে এই টেলিস্কোপ স্থাপন করেন। জ্যোতিপদার্থবিজ্ঞানী এডউইন হাবলের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য এটির নামকরণ করা হয় হাবল স্পেস টেলিস্কোপ (HST) [চিত্র ১১.১২] এই বিশেষায়িত টেলিস্কোপ মহাকাশের বিভিন্ন নক্ষত্র, গ্যালাক্সি ইত্যাদির স্পষ্ট চিত্র পৃথিবীতে প্রেরণ করছে, যা পর্যালোচনা করে মহাবিশ্ব সম্পর্কে অনেক নতুন নতুন তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। হাবল টেলিস্কোপ প্রেরিত তথ্য বিশেণ্ডষণ করে মহাবিশ্ব যে সম্প্রসারণশীল, তা প্রমাণিত হয়েছে।

১১.৪.৩ গামা রে টেলিস্কোপ
Gamma Ray Telescope

তাড়িতচৌম্বক বর্ণালীর মধ্যে গামা-রে হলো সবচেয়ে ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অর্থাৎ সবচেয়ে বেশি কম্পাঙ্কবিশিষ্ট। গামা রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিসর 10^{-15} m থেকে 10^{-11} m পর্যন্ড় বিস্ড়ৃত। সবচেয়ে শক্তিশালী ফোটন দ্বারা গামা রশ্মি গঠিত। ফলে এর ভেদন ক্ষমতা অত্যন্ড় বেশি।

গামা রশ্মি বিভিন্ন উৎস থেকে নিঃসৃত হয়: যেমন-
(ক) পরমাণুর নিউক্লিয়াস উচ্চ শক্তি স্ড়র থেকে নিম্ন শক্তি স্ড়রে স্থানান্ড়রের ফলে,
(খ) তেজস্ক্রিয় পরমাণুর ভাঙ্গনের সময় এ রশ্মি উৎপন্ন হতে পারে,

(গ) মহাজাগতিক উত্তপ্ত বস্তুসমূহে বিভিন্ন বিক্রিয়ার কারণে গামা রশ্মি উৎপন্ন হয়। যেমন- সুপারনোভা বিস্ফোরণ, নিউট্রন নক্ষত্র, পালসার, কৃষ্ণবিবর থেকে গামা রশ্মি নিঃসৃত হয়।

মহাজাগতিক গামারশ্মির উৎসগুলো জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের আগ্রহের ও গবেষণার বিষয়বস্তু। মহাকাশে সংঘটিত বিভিন্ন হিংস্র ঘটনায় (Violent Events) গামা রশ্মি উৎপন্ন হয়। মহাবিশ্বের বিভিন্ন নক্ষত্র, গ্যালাক্সিসমূহ হতে আগত গামারশ্মি বিশেণ্ডষণ করে নির্দিষ্ট মৌলিক পদার্থের উপস্থিতি ও সংঘটিত নিউক্লিয় ঘটনাগুলোর অস্ড়িত্ব নির্ণয় করা যায়।

চিত্র ১১.১৩

মূলনীতি: গামা-রে টেলিস্কোপ সাধারণ টেলিস্কোপের মতো নয়। এখানে প্রতিফলক হিসেবে দর্পণ ব্যবহার করা হয় না। কারণ গামা রশ্মি সাধারণ আলোর চেয়ে দশ মিলিয়ন গুণ শক্তিশালী এবং এক্স-রের চেয়ে হাজার গুণ শক্তিশালী। গামা রশ্মির ভেদনক্ষমতা অনেক বেশি হওয়ায় দর্পণের ভেতর দিয়ে চলে যায় এবং শোষণ বা প্রতিফলন ঘটে না। এ কারণে গামা রশ্মি সনাক্ত করার জন্য বিশেষ ধরণের ডিটেকটর ব্যবহার করা হয়। একে সিন্টিলেশন ডিটেকটর (Scintillation detector) বা দ্যুতিময় সনাক্তকারী যন্ত্র বলা হয়। ডিটেকটরের মধ্যে ঘন সন্নিবিষ্ট স্ফটিক এর বণ্ঢক থাকে। গামা রশ্মি ঐ ডিটেকটরের মধ্য দিয়ে যাবার সময় তাদের শক্তির কিছুটা অংশ দ্যুতিময় পদার্থের কণাগুলোতে স্থানান্ড়র করে। এর ফলে অধিক শক্তির আহিত কণা সৃষ্টি হয় যা সিন্টিলেটর এর কেলাসের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে নিম্ন শক্তির ফোটন তৈরি করে। এই নিম্ন শক্তির ফোটন সনাক্তকারী যন্ত্র দ্বারা সংগ্রহ করে আপতিত গামা রশ্মির তীব্রতা নির্ণয় করা যায় এবং এগুলো প্রতিবিম্ব তৈরি করে।

১১.৪.৪ এক্স-রে টেলিস্কোপ
X-ray Telscope

মহাবিশ্বের বিভিন্ন এক্স-রে উৎসগুলো দীর্ঘদিন ধরে জ্যোতির্বিদদের আগ্রহ ও আকর্ষণের বিষয়বস্তু হিসেবে কাজ করছে। মহাকাশে সংঘটিত বিভিন্ন ধ্বংসাত্বক (Violent) ঘটনা, যেমন- নক্ষত্রের বিস্ফোরণ থেকে এক্স-রে নির্গত হয়। এক্স রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য অত্যন্ড় ক্ষুদ্র বলে সাধারণ দর্পণগুলো এক্স-রে তরঙ্গদৈর্ঘ্য কাজ করে না। সাধারণ দর্পণে এ রশ্মি আপতিত হলে প্রতিফলনের পরিবর্তে এদের ভেতর দিয়ে ভেদ করে চলে যায়। এক্স-রে টেলিস্কোপ এসব রশ্মি পর্যবেক্ষণ এবং বিশেণ্ডষণ করে মহাজাগতিক ঘটনা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে। পৃথিবীর বায়ুমন্ডল কর্তৃক বেশিরভাগ এক্স-রশ্মি শোষিত হয়। তাই এক্স-রে টেলিস্কোপ কৃত্রিম উপগ্রহ, রকেট বা বেলুনে স্থাপন করা হয়।

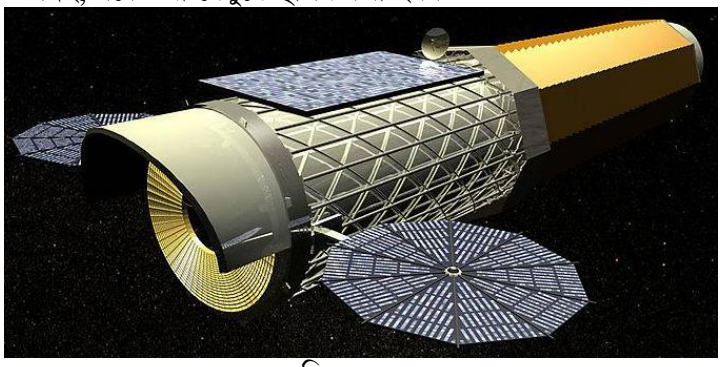

চিত্র ১১.১৪

মূলনীতি: এক্স-রে টেফিস্কোপে ধাতব নির্মিত দর্পণ ব্যবহার করা হয়। মহাজাগতিক উৎস থেকে আগত এক্স-রে যাতে টেলিস্কোপের দর্পণে শোষিত না হয়, এজন্য দর্পণের পৃষ্ঠগুলোকে স্বর্ণ বা ইরিডিয়ামের পাতলা স্ড়র দিয়ে প্রলেপ দেয়া হয়। এক্স-রশ্মিকে দর্পণ তলে অতি ক্ষুদ্র কোণে আপতিত ও প্রতিফলন করা হয়। যে বিশেষ প্রযুক্তি বা কৌশলের মাধ্যমে এটি করা হয় তাকে বলা হয় গ্রেজিং আপতন (Grazing Incidence) বা 'আলতো করে ছুড়ে দেওয়া' কৌশল। এই টেলিস্কোপে দর্পণগুলোকে এমনভাবে বসিয়ে নিখুঁতভাবে আকৃতি দেয়া হয় এবং তাদের পৃষ্ঠ বা তলগুলোকে এমনভাবে বসানো হয় যেন আপতিত এক্স-রশ্মির সাপেক্ষে এগুলো প্রায় সমান্ড়রাল হয়।

প্রতিফলিত এক্স-রশ্মি ফোটন ডিটেকটরে সংগ্রহ করা হয়। ডিটেকটর শোষিত ফোটনের শক্তি, সময় ও দিক রেকর্ড করে। প্রাপ্ত উপাত্ত বিশেণ্ডষণ করে মহাজাগতিক পরিবেশের গঠন এবং অবস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। ১৯৯৯ সালে স্থাপিত চন্দ্র (Chandra) নামক একটি এক্স-রে টেলিস্কোপ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে এবং ছায়পাথের বিভিন্ন নক্ষত্র, নিউট্রন তারকা, কৃষ্ণ বিবরের ছবি প্রেরণের মাধ্যমে নতুন নতুন তথ্য সরবরাহ করেছে।

সার-সংক্ষেপ :

রেডিও টেলিস্কোপ : যে যন্ত্রের সাহায্যে তারকা, গ্যালাক্সি, কোয়াসার এবং অন্যান্য নভোমন্ডলীয় বস্তু থেকে প্রাকৃতিকভাবে নির্গত তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গ (রেডিও তরঙ্গ) সনাক্ত ও পরিমাপ করে ঐ সব বস্তু সম্পর্কে অনুসন্ধান চালানো হয় তাকে রেডিও টেলিস্কোপ বলে।

কৃত্রিম উপগ্রহ : কৃত্রিম উপগ্রহ হলো এক ধরণের মহাশূন্যযান যা নির্দিষ্ট কক্ষপথ থেকে পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, বা অন্য কোনো গ্রহের চারদিকে আবর্তন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১১.৪

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। হাবলের টেলিস্কোপ একটি –
(ক) অপটিক্যাল টেলিস্কোপ (খ) রেডিও টেলিস্কোপ
(গ) এক্স-রে টেলিস্কোপ (ঘ) গামা-রে টেলিস্কোপ

২। রেডিও টেলিস্কোপ যে তরঙ্গ সনাক্ত ও পরিমাপ করে–
(ক) দৃশ্যমান আলোক তরঙ্গ (খ) বেতার তরঙ্গ
(গ) গামা রশ্মি (ঘ) এক্স রশ্মি

চূড়ান্ড় মূল্যায়ন

১। সূর্য কি ধরনের নক্ষত্র?
(ক) বামন নক্ষত্র (খ) শ্বেত বামন নক্ষত্র (গ) দানব নক্ষত্র (ঘ) অতি দানব নক্ষত্র

২। প্রোটিন ও নিউট্রন কি দ্বারা গঠিত?
(ক) কর্ক (খ) ডাউন (গ) কোয়ার্ক (ঘ) আপ

৩। কোয়াসার থেকে কী নির্গত হয়?
(ক) গামা রশ্মি (খ) এক্সরে (গ) অতি বেগুনী রশ্মি (ঘ) বেতার তরঙ্গ

৪। মহাবিশ্বের চূড়ান্ড় পরিণতি প্রধানত নির্ভর করে–
(i) মহাবিশ্বের জ্যামিতিক আকৃতি (ii) অদৃশ্য শক্তি
(iii) অদৃশ্য বস্তু

নিচের কোনটি সঠিক

(ক) i, ii ও iii (খ) i ও ii (গ) i ও iii (ঘ) ii ও iii

৫। নক্ষত্রের জ্বালানী পুড়ে শেষ হলে অবশিষ্ট হিসেবে থাকতে পারে-

(i) শ্বেতবামন (ii) নিউট্রন স্টার (iii) কৃষ্ণগহ্বর

নিচের কোনটি সত্য?

(ক) i (খ) i ও ii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৬। লেপটন কণার স্পিন–

(ক) 1 (খ) $\frac{3}{2}$ (গ) $\frac{1}{2}$ (ঘ) 0

৭। দুর্বল নিউক্লীয় বল সৃষ্টি হয়–

(ক) বিটা ক্ষয়ের জন্য (খ) প্রোটন ক্ষয়ের জন্য (গ) গামা ক্ষয়ের জন্য (ঘ) নিউট্রন ক্ষয়ের জন্য

৮। হাবল এর সূত্র অনুসারে ছায়াপথগুলোর অপসরণ বেগ দূরত্বের–

(ক) ব্যস্ড়নুপাতিক (খ) বর্গের ব্যস্ড়নুপাতিক (গ) সমানুপাতিক (ঘ) বর্গের সমানুপাতিক

(ঘ) সৃজনশীল প্রশ্ন

১। জ্যোতির্বিজ্ঞানী লেমাইটারের মতে 'মহাবিশ্ব সৃষ্টির শুর"তে বিশ্বের বস্তু এবং শক্তি উভয়ই একটি বিশাল ভরে কেন্দ্রীভূত ছিল। যার নাম তিনি দিলেন 'কসমিক এগ'। মহাবিস্ফোরণে (বিগব্যাং) এটি ফেটে চৌচির হয়ে যায়।

(ক) পালসার কী? ১

(খ) নিউট্রন স্টারকে পালসার বলা হয়– ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) উদ্দিপকের আলোকে মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) পদার্থ সৃষ্টি ও বিকরণ শক্তির বিবর্তনের ধারা বয়ে মহাবিশ্ব বর্তমানের এই অবস্থায় বিরাজ করছে। – উদ্দীপকের ধারণা থেকে উক্তিটি বিশেণ্ডষণ কর। ৪

২। রেডিও টেলিস্কোপ ও গামা রে টেলিস্কোপ প্রত্যেকটির কাজ ভিন্ন ধরনের। একটির জন্য এন্টেনা ও গ্রাহকযন্ত্র এবং অপরটির জন্য ডিটেকটর ব্যবহৃত হয়।

(ক) মহাবিস্ফোরণ কাকে বলে? ১

(খ) কৃত্রিম উপগ্রহের মূলনীতি কী? ২

(গ) উদ্দীপকে বর্ণিত দুটি টেলিস্কোপের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। ৩

(ঘ) রেডিও টেলিস্কোপ দ্বারা কীভাবে বেতার তরঙ্গ শনাক্ত করা যায় আলোচনা কর। ৪

(ঙ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন :

১। গ্যালাক্সি কী?
২। মহাবিস্ফোরণ কী?
৩। অদৃশ্য বস্তু কী?
৪। সমতল মহাবিশ্ব কাকে বলে?
৫। বিগ রিপ বলতে কী বোঝ?
৬। শ্বেত বামন কী?
৭। নিউট্রন তারকার কাকে বলে?
৮। কৃষ্ণবিবর কাকে বলে?
৯। মহাসংকোচন বলতে কী বোঝ?
১০। ফার্মিওন ও বোসন কণা বলতে কী বোঝ?
১১। কৃত্রিম উপগ্রহের সংজ্ঞা দাও।

(চ) বিশদ উত্তর প্রশ্ন :

১। মহাবিশ্ব সৃষ্টির রহস্য ব্যাখ্যা কর।
২। পদার্থবিজ্ঞানের আলোকে মহাবিশ্বের চূড়ান্ড় পরিণতি ব্যাখ্যা কর।
৩। বিগ ব্যাংগ তত্ত্ব বর্ণনা কর।
৪। রেডিও টেলিস্কোপের গঠন ও কার্যবলী বর্ণনা কর।
৫। কৃত্রিম উপগ্রহের বেগের রাশিমালা নির্ণয় করা।

(ছ) গাণিতিক সমস্যাবলিঃ

১। সূর্যের ভর 1.99×10^{30} kg। একটি নক্ষত্রের ভর সূর্যের ভরের 6 গুণ। এটি কৃষ্ণ বিবরে পরিণত হলে এর ঘটনা দিগন্ড়ের ব্যাসার্ধ কত হবে? [উত্তর : 17.70 km]

২। একটি নক্ষত্রের ভর 5 সৌর ভরের সমান। নক্ষত্রটির সোয়ার্জস্কাইল্ড ব্যাসার্ধ কত হলে এটি কৃষ্ণ গহবরে পরিণত হবে? [সূর্যের ভর, $M = 2 \times 10^{30}$ kg] [উত্তর : 14.8 km]

৩। দুটি কৃষ্ণবিবরের ঘটনা-দিগন্ড়ের ব্যাসার্ধের অনুপাত 2.25 ঃ 1। প্রথমটির ভর সূর্যের ভরের 5 গুণ হলে দ্বিতীয়টির ভর নির্ণয় কর। [উত্তর : 4.44×10^{30} kg]

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১১.১ : ১. (ঘ) ২. (ঘ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১১.২ : ১. (খ) ২. (খ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১১.৩ : ১. (খ) ২. (ক)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১১.৪ : ১. (ক) ২. (খ)

চূড়ান্ড় মূল্যায়ন

১। (ক) ২। (গ) ৩। (ঘ) ৪। (ক) ৫। (ঘ) ৬। (গ) ৭। (ক) ৮। (গ)